পরীক্ষার অগ্নিপরীক্ষা

শহীদ আখন্দ

গত ৮ই মে ছিল ১৯৯৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন। এদিন অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে সারাদেশে ৩ হাজারেরও অধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীর কাছে নকল সরবরাহ করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন রংপুর কারমাইকেল কলেজ, মাহিগঞ্জ ও কাউনিয়া কলেজের দু'জন শিক্ষক। তারাও বহিষ্কৃত হয়েছেন। নকল করতে বাধা দেয়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর কলেজের অধ্যক্ষের রুম ভাঙচুর করা হয়েছে। এদিন শিক্ষামন্ত্রী কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম ও চোয়ারা কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এই দু'টি কলেজ থেকে মাত্র ৩ বস্তা নকল উদ্ধার করা হয়েছে (উদ্ধার না করতে পারা নকলের পরিমাণ খবরে উল্লেখ করা হয়নি)। বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে নকল করার সুযোগ দেয়া হয়নি বলে ঐ কেন্দ্রে কিছু পরীক্ষার্থী হামলা চালায়। গলাচিপা কেন্দ্রে মাত্র ১০ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কলেজে হামলা চালায় বহিরাগতরা। এটা ছিল ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা। প্রথম দিন বলেই হামলা-হামলি হয়েছে কিন্তু হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, ঘটলে খবরে তা পরিবেশিত হতো।

ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা ছিল পরদিন। এদিন বহিষ্কারের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ৫ হাজার। বিভিন্ন স্থানে এদিন ছাত্র-পুলিশে সংঘর্ষ ও ভাঙচুর হয়েছিল। চট্টগ্রামের চন্দনাইশে পুলিশ ও ছাত্র-জনতার মধ্যে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া হয়েছে। সৌভাগ্যবশত ওখানে কেউ কাউকে ধরতে পারেনি। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ মুড়াপাড়া কলেজ কেন্দ্রে অবাধে নকল চলার খবর পত্রিকায় প্রকাশের কারণে কলেজের অধ্যক্ষ কেস্ নিজের হাতে তুলে নেন। তার হাতে কতিপয় অসতর্ক সাংবাদিক লাঞ্ছিত হয়েছেন। বলা হয়েছে, এরপরও যদি এজাতীয় মানহানিকর কোন সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাহলে তাদের বধ করা হবে। কুমিল্লার লাঙ্গলকোট কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা উপেক্ষিত হয়েছে। ওখানে আহতের সংখ্যা ১০। টাঙ্গাইলে সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কেন্দ্রে নকল সরবরাহে বাধা দেয়ায় পুলিশ ও বহিরাগতদের মধ্যে সংঘর্ষে সহকারী পুলিশ সুপারসহ ৬ জন পুলিশ ও অর্ধশতাধিক বহিরাগত আহত হয়েছে। বহিরাগতরা কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যবহৃত ২টি জীপ ও পুলিশের ২টি গাড়ি ভাঙচুর করে ও একটি মোটর সাইকেল পুড়িয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ১৩ রাউন্ড গুলি, ২ রাউন্ড রাবার বুলেট এবং ২৬ রাউন্ড গ্যাস সেল ব্যবহার করে। পরীক্ষার ব্যাপারে কড়াকড়ি করার ফলে অনেক শিক্ষক আহত হয়েছেন। সরকার তাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করবেন। পরীক্ষার চতুর্থ দিনে বাংলা ২য় পত্রের পরীক্ষায় কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া কলেজ-মাঠে ১৪ বস্তা নকলের বহ্নি উৎসব হয়েছে।

এই পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগের দিন কোন এক কলেজের অধ্যক্ষকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছিল যে, পরীক্ষার প্রথম দেড় ঘন্টা অবাধে নকল করতে না দিলে কলেজের ভেতরে টাইম বোমা রাখা হয়েছে, কলেজ উড়িয়ে দেয়া হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ যথারীতি ভয় পেয়ে পুলিশের শরণাপন্ন হন। পুলিশ কলেজে এসে বোমা পায়নি। নির্মাণাধীন দোতলায় পেয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রের কারখানা এবং সেখানে তৈরি কিছু পাইপগান।

উপরের সবগুলো বর্ণনা আমি বিভিন্ন খবরের কাগজ থেকে, বলা যায় নকল করে লিখেছি। এর একটি কথাও আমার বানানো নয়। ফেলানো তো নয়ই। পরীক্ষায় দারুণ ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে— একথা বলার জন্য আমি এসব তথ্য উপস্থাপন করিনি। এটা আমি করেছি কেবলমাত্র এই প্রশ্নটি নিজের কাছে করার জন্য যে, পরীক্ষার এই বেহাল অবস্থা আমাদের জাতীয় জীবনের কোন প্রতিবিম্ব নয় তো? বুঝতে হবে যে, এটি একান্তভাবে শিক্ষা, ছাত্র ও পরীক্ষার এলাকা। এখানে অন্য কোন বিবেচনা বা পক্ষ প্রাসঙ্গিক নয়। এই এলাকায় ছাত্রদের উচিত কর্ম অধ্যয়নকে তপস্যা করার, শিক্ষকদের উচিত কর্ম ছিল সৎ-গুরু হয়ে প্রকৃত পিতার ধর্ম পালন করা। এর কোনটির প্রতিফলন সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে ঘটেনি। বরং এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে যে, অসদুপায় অবলম্বন একটি মারাত্মক ব্যাধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং এটি ছাত্রদের দেহে সীমাবদ্ধ নেই। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে আমরা জানলাম, এই ব্যাধিতে ছাত্রের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক সবাই আক্রান্ত। যদি এর কোন প্রতিকার বিধান করা না হয় তাহলে সমস্ত সমাজদেহকে এই রোগ ক্ষতবিক্ষত করবে। তার একটি আলামত ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজনের রেকর্ডে পরে পাওয়া গেছে, একবার নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ে তিনি শাস্তি পেয়েছিলেন। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তুলনীয় কলেজের সেই অধ্যক্ষ, যিনি নকলের খবর কাগজে প্রকাশ করার দায়ে সাংবাদিকদের লাঞ্ছিত করেছেন এবং ভবিষ্যতে এধরনের বেয়াদবির পুনরাবৃত্তি হলে তাদের হত্যা করার অভিলাষ প্রকাশ করেছেন।

ছাত্রদের ব্যাধিস্বরূপ এই প্রবণতা শিক্ষকদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, একথা বলা চলে। যদিও সেই লক্ষণের হার ছাত্রদের ব্যাপারটির মতো ততো পাইকারি নয়। আসলে ছাত্রদের এই অসুখটিও একদিন মহামারী ছিল না। গোড়ায় যখন এই উপসর্গ একটু-আধটু ধরা পড়ছিল তখন একে অবহেলা করা হয়েছে বলেই আজ এই অবস্থা। আর এই অবহেলার জন্য ছাত্রদের এককভাবে দায়ী করতে পারলে অন্যদের বলাবাহুল্য সুবিধা হয়। শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক পর্যায়ে অবহেলা প্রদর্শিত হলে একদিন শিক্ষকদের মধ্যেও অসাধু মনোভাব দুরারোগ্য ব্যাধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, আর তখন আমরা সবাই এর জন্য কেবল শিক্ষকদের দায়ী করে সন্তুষ্ট হবো। এটা কোন গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব নয়। আবার অন্যদিকে ঘটনা এতদূর গড়িয়েছে যে, একে নিয়ন্ত্রণ করার কোন পথ আছে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ লেখাপড়া হবে, পরীক্ষা হবে, পরীক্ষায় নকল হবে, সেই নকল সরবরাহ করবেন পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং সদাশয় জনপ্রিয় শিক্ষকবৃন্দ। এমনি করে সৎ ও সুন্দর হওয়ার মাধ্যম শিক্ষা থেকে 'সদুপায়' বহিষ্কৃত হবে, আমাদের দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে, দারিদ্র্য বিমোচিত হবে, সবাই খুশি থাকবো এবং অনেক পাশপুশ করেও আমরা যে কিছুই জানি না দেশের বাইরে না গেলে তা ধরা পড়বেনা।

তবে এবার বস্তায় বস্তায় নকল উদ্ধার করার ফলে একটা শুভ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। বিষয়টি নাগরিক বিবেককে যে আন্দোলিত করেছে তা বোঝা গেছে, এ বিষয়ে আপামর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের অভিমত প্রকাশের বহর থেকে। এসব অভিমত আমি শুনতে চাইনি। নানা জায়গায় আমার কানে চলে এসেছে। কোন কোনবার অবিশ্বাস্য স্থানে সন্দেহজনক পাত্রের মুখ থেকে সুচিন্তিত এসব মতামত উচ্চারিত হয়েছে।

একজন বলেছেন, পরীক্ষার সিস্টেম উঠিয়ে দেয়া উচিত। ১২ বছর যে ছেলে লেখাপড়া করেছে, কখনো ফেল করেনি, তার আবার পরীক্ষা কিসের? অন্যজন বললেন, পৃথিবীর সবদেশে পরীক্ষা হয়, আমাদের হবে না? উত্তর, পৃথিবীর সব দেশ আর আমরা এক নয়। সবখানে সব জিনিস চলে না, এটা তো একটা গোমূর্খও জানে।

আমাদের বুয়ার সাহেব একজন মাটি কাটার মিস্ত্রি। তিনি নিজে আমার বাসায় এসে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে গেছেনঃ সবখানে যদি নকল হয় তাহলে পরীক্ষায় কেন হইবো না ছার!

আমার বাগানে পিঁপড়ার যন্ত্রণায় চালকুমড়া, ঢেঁড়স ও শশাগাছ একটাও বাড়তে পারছে না। গাছের ডগায় কচিপাতার রসে বুঝি পিঁপড়ার ফেনসিডিল আছে— লাল গাট্টাগোট্টা পিঁপড়া হাজারে হাজারে সারাক্ষণ ওখানে পড়ে থাকে। পারতপক্ষে আমি বাগানে কোন কেমিক্যাল ব্যবহার করি না। অনবরত ছাই দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু শহরের পিঁপড়া, ছাই চিনে না, খেয়ে ফেলে। এখন আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে গাছ বাঁচাব না পিঁপড়া বাঁচাব। আমি এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চিন্তায় বলতে গেলে মগ্ন ছিলাম, তখন পেছন থেকে আমার স্ত্রীর গলা শোনা গেলঃ দু'রকম পরীক্ষার সিস্টেম করলে হয় না? একটা পরীক্ষা হবে 'উইথ নকল' আর একটা হবে 'উইদাউট নকল'?

আমি বললাম, অত্যন্ত সুন্দর প্রস্তাব। কিন্তু সেটা ঠিক করবে কি করে? কারা 'উইথ' হবে, কারা 'উইদাউট'হবে?

স্ত্রী সবদিক বিবেচনা করে এসেছেন, বললেন, ফরম ফিল-আপ করার সময় একটা কলাম থাকবে 'উইথ না উইদাউট'। ছাত্র যেকোন একটা রাখবে, অন্যটা কেটে দেবে।

আমি তর্ক করলাম, জানি তার সঙ্গে তর্কে নামা বিপজ্জনক, তবু। বললাম, দুটো শব্দই 'ডাবলিও' দিয়ে যে! স্ত্রী বললেন, কেন, 'প্লাস নকল' ও 'মায়নাস নকল' করে দিলেই হবে।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলাম। আমি জানি, কোন ছাত্র ফরমে 'প্লাস নকল' লিখবে না। এটুকু সততা সবার মধ্যে আছে। কিন্তু সে কথা ওকে বলা যাবে না। কারণ তাতে আমার মধ্যে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা ফুটে উঠবে। গতবছর নান্দাইল কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়েছিল ১৪৭২ জন। পাস করেছিল মাত্র ৫২ জন। এরকম কোন ব্যবস্থা করা যায় না, অবাধে নকল করার সুযোগ দেয়া হবে, কিন্তু কেউ পাস করবে না? ১০টা প্রশ্নের মধ্যে ৭টা থাকবে নকলযোগ্য আর ৩টি নকল-অযোগ্য। অর্থাৎ এই ৩টির জবাব লিখতে হলে বিদ্যা লাগবে। আর সেই ৩টা প্রশ্নের উত্তরই প্রাপ্ত নম্বরের বহর ঠিক করবে? অবাধ্য রুগীর চিকিৎসা এমন করে করা যায় না যাতে রুগী টের না পায় যে, চিকিৎসা চলছে।

দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... 27 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...